জ্যাঠামণি ডাক্তার নগেন্দ্রকুমার বল

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

বিজ্ঞানের কথা ছোটদের কাছে গল্পের মত করে বলবার প্রয়োজন কতখানি, তা বুঝেছি বিদ্যার্থীদের সান্নিধ্যে এসে। স্বল্পপরিসরে উড়ন্ত জীবদের কথা বলেছি গল্পের সূত্রে। সে গল্পের নায়ক হল শেয়ালপণ্ডিত। পরিভাষার কোন কচকচি না এনে নিছক গল্পকেই মুখ্য করতে চেষ্টা করেছি। বলাবাহুল্য যে, গল্পের গতি বিজ্ঞানেরই পথরেখায়।

এ গল্প যদি ছোটদের ভাল লাগে এ ধরনের নতুন কিছু লিখতে প্রেরণা পাব।

কাজল বল

এক

—চল্ চল্ দেখি, কোথায় দেখেছিস আমার ভাইকে ডানা মেলে আকাশে উড়ে বেড়াতে ?—এই বলে শেয়ালপণ্ডিত তার ছাত্র ভেড়ার কান ধরে হিড়্ হিড়্ করে টানতে টানতে পাঠশালা থেকে বের করে নিয়ে এলো। —যদি দেখাতে না পারিস তো তোকে আর আস্ত রাখবো না।

—ভেঁ ভেঁ ভেঁ উঃ বড্ড লাগছে পণ্ডিতমশাই।

—লাগুক। বল্ এবার কোনদিকে যেতে হবে।—পণ্ডিতমশাই ধমক দিয়ে উঠলেন।

—সোজা চলুন—ভেড়া কাঁদকাঁদ স্বরে বললো।

—তাই চল্—বলে শেয়ালপণ্ডিত ভেড়ার কান ধরে টানতে টানতে পথ চলতে লাগলো।

ঠিক এই সময় গাছের ডাল থেকে কে একজন বললো,—পণ্ডিতদাদা, ও পণ্ডিতদাদা, অত হন্তদন্ত হয়ে ছুটছো কোথায় ? ও বেচারার কানটা ছেড়ে দাও। ওর কান দিয়ে রক্ত পড়ছে যে !

—কে, কে এটা ? আমার ওপর খবরদারি !—এই বলে শেয়ালপণ্ডিত গাছের দিকে তাকালো। দেখলো ডালপালার আড়াল থেকে মুখ বের করে একটা শেয়াল গাছের ওপর বসে আছে। তাকে দেখে বললো,—হ্যাঁরে তোর সাহস তো কম

নয়। গাছে উঠেছিস কেন? পড়ে তো হাত পা ভাঙবি। নাম শিগ্‌গির।

—হুঁয়া-হুঁ-হিঁ-হিঁ—গাছেবসা শেয়ালটা হেসে উঠলো। —বলছো কি দাদা, তোমার মত ভাবলে নাকি আমাকে? এই বলে সেই শেয়াল ডালপালা সরিয়ে আর একটা ডালে এসে বসলো। —আরে পণ্ডিতদাদা তোমাদের ওই কাদামাটির মধ্যে আমি নামি না। গাছে গাছে ঘর করে থাকি, ডালে ডালে ঘুরে বেড়াই, ইচ্ছে হলে ডানা মেলে আকাশে গা ভাসিয়ে দিই।

ভেড়া পণ্ডিতমশায়ের কানে কানে বললো—এই তো সেই উড়ন্ত শেয়াল যাকে আপনার ভাই বলেছিলাম, এ বোধ হয় আপনার বোন।

শেয়ালপণ্ডিত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো এই উড়ন্ত শেয়ালটাকে। মাথা আর দেহ মিলে এক ফুট লম্বা হবে। পা থেকে মাথা প্রায় সোয়া দু'ফুট। ডাল পাল্টাবার সময় যখন ডানা মেলেছিল প্রায় পাঁচ ফুট জায়গা লেগেছিল উড়ন্ত শেয়ালটার। চোখ, মুখ, কান সবই তার মত দেখতে। এমন কি গায়ের রং আর দেহটা পর্যন্ত। শুধু সামনের পা'টা পাখীর ডানার মত চামড়ার পর্দা দিয়ে আটকানো। আর পিছনের পায়ের আঙুলগুলো আংটার মত দেখতে।

সন্দেহ হলো ডানাটা নকল বলে। তাই জিজ্ঞেস করলো,—হ্যাঁরে, তুই ডানা পেলি কোত্থেকে? দ্যাখ ওটা খুলে ফ্যাল। ওসব নকল ডানা গায়ে লাগাবি তো ওই দাই-দেলাসের ছেলের দশা হবে। শুনিসনি ওরা বাপছেলে ওই নকল ডানা লাগিয়েই প্রাণ হারালো?

এবার একটু পুজো আচ্চা কর, ধর্মকর্মে মন দাও, তোমার পিতৃপুরুষেরা শান্তি পাবেন।

—তোরা বুঝি শুধু এখানেই থাকিস ?

—আরে না না পণ্ডিতদাদা, শুধু ভারতবর্ষের এই সব বনে জঙ্গলে নয়, মালয়, অষ্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ, বলতে গেলে পৃথিবীর সব জায়গাতেই আমাদের ঘর আছে।

উড়ন্ত শেয়ালটা একবার সূর্যের দিকে তাকালো। বোধ হয় সময়টা দেখলো। তারপরই চঞ্চল হয়ে বললো,—যা ! কথায় কথায় একেবারে দেরী করে ফেললাম। ছেলেটার যে দুধ খাবার সময় হলো।

—এই বলে ডানা মেলে শূন্যে লাফিয়ে পড়ে গা ভাসিয়ে দিল

শেয়াল অবাক বিস্ময়ে সেই দিকে চেয়ে রইলো। মনে মনে ভাবলো, ইস্ সেও যদি অমনি ডানা মেলে আকাশে পাড়ি দিতে পারতো !

শেয়াল পণ্ডিত আবেগে একবার শূন্যে লাফিয়ে উঠলো।

ছাত্র ভেড়া পণ্ডিতমশায়ের কাণ্ড দেখে হাসি চাপতে পাশের ঝোপে সরে গেল।

এতক্ষণ উড়ন্ত শেয়ালের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভেড়ার কথা ভুলেই গিয়েছিল। এবার ভেড়াকে ডেকে হাসতে হাসতে বললো,—ওহে ভেড়া, তুই যে সত্যি আমার চাইতেও পণ্ডিত হয়ে গেলি রে ! যাক, বড় খুশি হলাম তোর পাণ্ডিত্য দেখে।

ভেড়া শুনে আনন্দে গড় হয়ে প্রণাম করলো।

শেয়াল পণ্ডিত বললো,—শোন্ পাঠ শেষে গুরুদক্ষিণা দেবার রীতি আছে। তা তুই দক্ষিণা দিয়েই যা।

সবই বুঝলাম। ওই ডানাওয়ালা লেমুরটা নিরামিষাশী, না গো গিন্নী?

—হ্যাঁ তারা মাংস খায় না। এই ফলমূল, ফুল, পাতা এই সব খায় আর কি।

—নাঃ! এবার বৈষ্ণব হতে হবে দেখছি। তা না হলে আমার আর ডানা গজাবে না। সব ব্যাটা নিরামিষাশীদের ডানা আছে। এই বলে আক্কা হুঁয়া হুঁয়া হুঁ ডাক দিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো। চেষ্টা করলো উড়তে। কিন্তু পারলো না। একটা কাঁটা ঝোপের উপর আছাড় খেয়ে পড়লো।

তিন

এদিকে ছোট্ট ভেড়া শেয়ালপণ্ডিতের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগলো।

ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো এক সময়। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলো। আর খুব সতর্ক হয়ে তাকাতে লাগলো এদিক-ওদিক। কান খাড়া করে, নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

যাক, আর ভয় নেই। শেয়ালপণ্ডিতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। বাঃ বাঃ, যে ভাবে ঝাপটে ধরেছিল আর একটু হলেই আর রক্ষে ছিল না।

ভেড়া একটু নড়ে চড়ে গাছটার তলায় হাঁটু মুড়ে বসলো।

সামনের গাছের ডাল থেকে একটা কাঠবিড়ালী ভেড়ার কাণ্ডগুলো দেখছিল। সে একটু এগিয়ে এসে বললো,—ও ভেড়া ভাই কি হলো, অত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?

ভেড়া মুখ তুলে তাকালো কাঠবিড়ালীটার দিকে। একটু অবাক হলো এই কাঠবিড়ালীটাকে দেখে। অন্য কাঠবিড়ালীর চাইতে এর কিছুটা তফাৎ আছে বলে মনে হলো। গায়ে কেমন আলোয়ান গোছের কি একটা জড়ানো।

তাই জিজ্ঞেস করলো,—কে গো তুমি? কি নাম তোমার?

উড়ন্ত শেয়াল শুনে অট্টহাসিতে গাছপালার পাতা নাড়িয়ে বললো,—কি যে বল দাদা, বিদ্যার অহংকারে তুমি চোখকান দু'ই খুইয়েছো। এ ডানা কি খোলা যায় না লাগানো যায়! প্রাণীবিদ্যায় টেরোপাসের নাম শোননি, সেই উড়ন্ত শেয়াল আমি। এ ডানা তো আমার জন্মগত।

—জন্মগত! অমনি বললেই হলো। তবে তো আমারও হতে পারতো। আমার ডানা গজালো না অথচ তোর হলো এ কেমন কথা!

—না! তুমি শুধুই পণ্ডিত সেজেছো, আসলে কিছুছু জানো না। আরে দাদা সবার উপরে ভগবান আছেন, বিচার করে তিনি সৃষ্টি করছেন সব। পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চার করলেন তো তিনিই। তাঁর ধারাবাহিক সৃষ্টির পথে সরীসৃপের পরেই তিনি পাখী আর আমাদের, মানে তোমাকে, আমাকে, ওই মানুষকে সৃষ্টি করলেন। অবশ্য নতুন কিছু না। ওই সরীসৃপের কাঠামোকেই একটু এদিক ওদিক সাজিয়ে শ্রেণীবিভাগ করে গড়ে তুললেন আর কি! কিন্তু কি জানো, তোমার পূর্বপুরুষদের মন খুব ছোট ছিল। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট ছোট জীবজন্তুদের ধরে ধরে খেতে লাগলো, মাটিতে গড়াগড়ি খেলো। আমাদের মত ফলমূল খেয়ে সন্তুষ্ট হলো না। তাইতো ভগবান তোমার পূর্বপুরুষদের আর রাগ করে ডানা দিলেন না। আমরা গাছে গাছে থাকতে, হাওয়ায় সাঁতার কাটতে ভালবাসতাম, তাই ভগবান আমাদের ডানা দিলেন।

উড়ন্ত শেয়াল ডানা মেলে একবার গা ঝাড়া দিয়ে বললো,—পণ্ডিতদাদা, এই সব কচি কচি বাচ্ছাদের ওপর লোভ দেওয়া ছেড়ে দাও। ক'দিন আর এভাবে অন্যের ঘাড় মটকাবে।

—বাঃ আমায় চিনতে পারছো না! কাঠবিড়ালী গো, কাঠবিড়ালী।

—হুঁ তাতো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তোমার গায়ে ওটা কি?

—ও হো এটার কথা বলছো! এই বলে হাসতে হাসতে

গায়ের চাদরের মত চামড়াটা প্যারাসুটের মত মেলে ভেড়ার কাছেই একটা ডালে এসে বসলো।

ভেড়া অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

ওড়ার সময় দেখলো হাতের এবং পায়ের আঙুলগুলোর

সাথে চামড়ার চাদরটা লাগানো। গায়ের রংটা লাল। সাধারণ কাঠবিড়ালীর চাইতে আকারে অনেক বড়।

ভেড়া বড় বড় চোখে কাঠবিড়ালীর দিকে তাকিয়ে বললো,—আচ্ছা কাঠবিড়ালী, তুমি কি উড়তে পারো? ওটা কি তোমার ডানা?

—কাঠবিড়ালী হাসতে হাসতে ভেড়াকে বললো,—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, দেখলে না—আমি তো উড়েই তোমার কাছে এলাম। আর উড়ি যখন, তখন এটা ডানা বই কি! আমার ডানায় পালক নেই, শুধু চামড়া দিয়ে তৈরী। পাখীর ডানার সঙ্গে শুধু এটাই তফাৎ। আর হবে নাই বা কেন, তাদের তো ভগবান ডানা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর আমরা তো এ ডানা বলতে গেলে নিজেরাই চামড়া দিয়ে তৈরী করে নিয়েছি।

—তোমরা তৈরী করেছো! বাঃ বেশ মজার তো। আমাকে কৌশলটা শিখিয়ে দাও না ভাই। আমার খুব ইচ্ছে, তোমাদের মত উড়ে বেড়াই। —ভেড়া উৎসাহে উঠে দাঁড়ালো।

ভেড়ার কথা শুনে কাঠবিড়ালী বললো,—তোমার ইচ্ছে হলেই কি তুমি তা তৈরী করে পরতে পারবে, সে মানুষেরা পারে। তাই তো আমাদের মধ্যে তারা শ্রেষ্ঠ।

—তা হলে তুমি তৈরী করে পরলে কি করে?

—আরে না না, আমি তৈরী করিনি। আমি বলেছি, আমরা মানে আমার পূর্ব পুরুষেরা, এই ঠাকুরদাদার দাদুর দাদুরা। সবাই খুব ওড়ার চেষ্টা করতো। এ গাছ থেকে ওগাছ, ওগাছ থেকে এগাছ লাফালাফি করার সময় নিজেদের চামড়াগুলোকে যতটা পারে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ডানার মত চওড়া করতো। শুধু তারা নয়। তাদের ছেলেরা, নাতি নাতনিরা

ভেড়া জানালো তার কাছে তো এখন কিছুই নেই, তার বাবাকে খবরটা দিলে তিনি নিজেই দিয়ে যাবেন। শেয়ালপণ্ডিত কিছুতেই রাজী হলো না।

বললো,—বিদ্যা অর্জন করলি তুই, আর দক্ষিণা দেবে তোর বাবা ; এ আবার কোন ধরণের কথা রে ?

—বাঃ রে এখন যে আমার কাছে কিছুই নেই।

—একলব্য দ্রোণাচার্যকে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা দক্ষিণা দিয়েছিল। আর তুই না হয় আমাকে তোর দেহটাই দে, এত দিনের পরিশ্রম সার্থক করি। —এই বলে ঝাপটে ধরলো ভেড়াকে।

ভেড়া শেয়ালপণ্ডিতের মতলব বুঝে চিৎকার করতে লাগলো।

দু'জনে ধ্বস্তাধ্বস্তি হলো খুব। শেয়ালপণ্ডিত ভেড়ার ঘাড় মটকাতে গিয়ে পা পিছলে মাটিতে পড়ে গেল। এই সুযোগে ভেড়া,—ভেঁ ভেঁ, বাঁচাও বাঁচাও—বলে চীৎকার করতে করতে চোঁ চাঁ দৌড় দিয়ে গভীর বনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শেয়াল মাটি থেকে উঠেই ভেড়ার পিছু নিল। কিন্তু ভেড়া যে কোন্ পথে হারিয়ে গেল তার আর হদিশ পেলো না। এদিক ওদিক খোঁজাখোঁজি করে হাল ছেড়ে দিয়ে শেষে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো।

দুই

শেয়াল হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরছিল। পথে শেয়াল বউ-এর সঙ্গে দেখা। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শেয়াল পণ্ডিত বললো,—শেয়ালবউ, চল আমরা এ বন থেকে চলে যাই। এখানে টেকা দায় হয়ে পড়েছে।

—কেন গো, কি হোল আবার?

—লজ্জা, লজ্জা! শেষে কিনা ছাত্র ভেড়ার কাছে শিখতে হলো উড়ন্ত শেয়ালের কথা। শুধু কি তাই, একেবারে হাতে-নাতে দেখিয়ে দিল।

—ও! এই। —শেয়াল বউ হাসলো। আমি ভাবলাম কোন বিপদ হলো বুঝি। এতে লজ্জা পাবার কি আছে। আজকাল কত যে আমাদের মত দুধখেকোর দল ডানা মেলে ওড়ে তার কি ঠিক আছে!

—আজকাল নয় গো গিন্নি আজকাল নয়, আমাদের পূর্বপুরুষের আমল থেকেই এরা বাস করে আসছে।

—হতে পারে। তাচ্ছিল্য করে শেয়াল-বউ বললো,—সেবার যখন একদল মানুষ এসে আমায় ধরে নিয়ে চলে গেল, তখন জানো তারা আমায় ফিলিপাইন দ্বীপে চালান দিয়েছিল। সেখানে আমাকে যে ঘরে তারা রাখলো সেখানে দেখি ফারের র‍্যাপার জড়িয়ে এক শেয়াল বসে আছে। সে আমার জড়সড়

ভাব দেখে আলাপ করতে এগিয়ে এলো। ওমা, তাকে দেখেই অবাক হয়ে গেলাম।

তারপর শেয়াল বউ হাসতে হাসতে বললো,—তোমায় কি বলবো, সে যে কি চেহারা, না দেখলে ঠিক বুঝবে না।

—কেন গো, শেয়াল বলছো যখন, আমাদের মতই তো চেহারা হবে।

—না গো না, শেয়াল নয়, সে নাকি লেমুর, উড়ন্ত লেমুর।

—তুমি যে প্রথমে শেয়াল বললে গিন্নি ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, কি করে জানবো যে তার শুধু মুখটাই আমাদের মত। আকারটা ওই কাঠবিড়ালীদের মত হবে। আবার কি জানো, হাত এবং পায়ের তালু আংটার মত। গায়ে ফারের র‍্যাপার জড়ানো। সে এক বিচিত্র দেখতে। —শেয়াল বউ একবার ওই জায়গায় গোল হয়ে ঘুরে হাঁটু গেড়ে বসলো।

—আরো মজার কি জানো কর্তা। পরে জানলাম ওই ফারের র‍্যাপার নাকি র‍্যাপার নয়, ওটা ওর ডানা। অবাক হলাম শুনে। ডানা! এদিকে আলাপের সময় বলেছিল সে আমাদের মতই দুধখেকো পরিবারের লোক। তবে তার ডানা হবে কি করে ? আমার প্রশ্ন শুনে সে সত্যি সত্যি লাফিয়ে ডানা মেলে উড়তে লাগলো। আমার চোখ তো চড়ক গাছ! একি, এ যে সত্যি ডানা মেলে উড়ছে! সে যখন উড়ছিল, তাকে ঠিক ফারের ঘুড়ির মত দেখাচ্ছিল। ডানাটা ফারের চামড়া দিয়ে তৈরী। এই ফারের চামড়াটা গা থেকে শুরু করে লেজ পর্যন্ত জুড়ে আছে। হাত এবং পায়ের আঙুলগুলোর সাথেও শক্ত করে আঁটা।

—শুধু কি ফিলিপাইনেই ওরা থাকে গিন্নী ?

—না গো না, ওরা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপগুলোতেও থাকে। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শেয়াল-বউ বললো,—বেচারার জন্য

দুঃখ হয়, এত ধার্মিক সে, তবুও তার কোন ছেলেপুলে হলো না। তাদের পরিবারেও দু'টি মাত্র প্রাণী নাকি বেঁচে আছে।

শেয়ালপণ্ডিত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো,-

বললো,—বেচারা ভেড়া ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমরা ভাই যেও না, চারদিকে পাহারা দাও। এ বনে ওর কত শত্রু আছে। আমরা ফেলে চলে গেলে বেচারা এখানেই প্রাণ হারাবে।

—ঠিক বলেছো ভাই। এলামই যখন কাশ্মীর থেকে তোমার দেশে বেড়াতে, দু'চার দিন থেকেই যাবো। ভেড়ার সঙ্গেও আলাপ করবো। তারপর তোমাদের আসামের জঙ্গলটাও দেখে যাবো।

এই বনে সুদূর বর্মা থেকে এক কাঠবিড়ালী এসেছিল। সে বললো,—আচ্ছা ভাই লাল কাঠবিড়ালী, তোমাদের দেশে আর কোথায় কোথায় আমাদের জাত ভাইরা আছে ?

—সে ভাই সব জায়গাতেই পাবে। গঙ্গা নদীর দু' ধারের জঙ্গলে, হিমালয়ের পাদদেশে, আরো কত জায়গায়, তাই না কাশ্মীরী কাঠবিড়ালী ভাই !

—হ্যাঁ হ্যা তা যা বলেছো, নাও নাও এবার আর কথা বলো না। এবার চল পাহারা দিই। হিংস্র জন্তুরা এলে ভেড়াকে সাবধান করে দেওয়া যাবে।

অন্য কাঠবিড়ালীরা সায় দিল প্রস্তাবটাতে। আর কোন কথা না বলে ভেড়াকে গোল করে ঘিরে সবাই পাহারা দিতে লাগলো।

পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ভেড়া উড়ন্ত কাঠবিড়ালীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার পথে বেরুলো।

এ পথ থেকে ও পথ। এ বন থেকে ও বন। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে ইন্দোচীন সীমানার কাছাকাছি এসে পড়লো।

তবু থামলো না, শেয়ালপণ্ডিতের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। বন আর শেষ হয় না। জনপথের আশায় এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে পথ চলছিল।
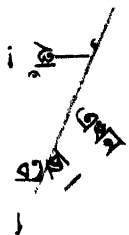
চেষ্টা করতো। তারপর আস্তে আস্তে হয়ে গেল। পাখীর ডানার মত পালক র তৈরী প্যারাসুটের মত হয়ে গেল।

শক্তির কথা শুনে ভেড়া অবাক হয়ে গেল। করলো,—আচ্ছা ভাই কাঠবিড়ালী, তোমরা পাখীদের উড়তে পারো ?

—দূর ! কি যে বল তার নেই ঠিক। ওদের মত উড়তে পারবো কি করে? পাখীরা তো অন্য জাত। মানুষ তো আমাদের জাতভাই কিনা তাই ওদের তৈরী প্যারাসুটের মতই আমাদের ডানা কাজ করে। এর সাহায্যে শূন্যে ভাসতে পারি, যেখানে খুশি নামতে পারি, তার বেশী না।

এমন সময় একটু দূরে ঝোপ ঝাড়টা নড়ে উঠলো। ভেড়া শব্দ শুনে ভয় পেয়ে গেল।

কাঠবিড়ালী চুপি চুপি ভেড়াকে বললো,—ভেড়া ভাই, এই ঝোপের ভিতর চুপটি করে বসে থাকো। আমি দেখে আসি শব্দটা কে করলো।

ভেড়া তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো ঝোপের ভিতর। উড়ন্ত কাঠবিড়ালী ডানা মেলে ডালে ডালে উড়ে উড়ে বসে, সেই শব্দ লক্ষ্য করে হারিয়ে গেল গাছ গাছালির আড়ালে।

সন্ধ্যার সময় ফিরে এলো সেই কাঠবিড়ালীটা। সঙ্গে আরো চার পাঁচটা কাঠবিড়ালী। সবারই ডানা আছে। তবে তাদের দেহের আকার ও গায়ের রং ভিন্ন ভিন্ন। সবার হাতেই ফলমূল সব রয়েছে। সেগুলো ভেড়ার সামনেই এনে নামিয়ে রাখলো।

ভেড়া কাঠবিড়ালীর পথের দিকে তাকাতে তাকাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে উড়ন্ত প্রথম কাঠবিড়ালীটা

চার

এমন সময় কাদের কথাবার্তা শুনে থমকে দাঁড়ালো।

একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে সে তাকিয়ে দেখলো, মাটিতে এবং ছোট ছোট আগাছার ডালে কতকগুলি গিরগিটি বসে জটলা করছে।

—শুনছো তো ভাইয়া, এই সীমানা নিয়ে চীন ভারতের যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

আশ্চর্য! যুদ্ধ করতে ওদের একটুও লজ্জা করে না। এই বলে মানুষ সভ্য জাত। একের দুঃখে অপরে কষ্ট পায়। যুদ্ধের যে কি বিভিষিকা ওরা জানে না—না কখনো তা দেখিনি! —ছিঃ ছিঃ।

—কিন্তু ভাই আমরা যাই কোথা, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে যে মরতে হবে। আমার বোনের আবার পাঁচটি ডিম আছে। সে বেচারী ডিম আগলে কেঁদে কেঁদে খুন। তার তো আর ছেলেপুলে নেই। তাই এগুলো নষ্ট হলে সে পাগল হয়ে যাবে।

—আরে ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না। চীন ভারত যুদ্ধ করছে তো বয়ে গেল। চল আমরা সব মামার বাড়ী দাক্ষিণাতে্য চলে যাই। যুদ্ধ থামুক তারপর আবার ফিরে আসবো।

—হ্যাঁ ঠিক বলেছো ভাই। চল চল আমরা সব মামার বাড়ী যাই। মনে নেই কিছুদিন আগে মামা খবর পাঠিয়েছিল

ওদের ওখানে ফিলিপাইন, পূর্বভারতীয় ইত্যাদি দেশ থেকে আমাদের বিদেশী ড্রাকো ভাইবোনেরা বেড়াতে এসেছে।

—বাঃ কি মজা। চল আমরা আজই রওনা দিই। বিদেশী ভাইদের সঙ্গে খেলবো, গাইবো, নাচবো।

টিকটিকাটিক টিক কর্‌র্‌র্‌—কী মজা—এই বলে সেই গিরগিটিটা শূন্যে লাফিয়ে উঠলো। ডিগবাজী খেলো অনেকবার।

অবাক হলো ভেড়া দেখে। একি, এ গিরগিটিটারও যে ডানা আছে! তার সামনে একটি ঝোপের ফুলে একটা

প্রজাপতি বসে ছিল, সেই গিরগিটিটাও লাফিয়ে এসে প্রজাপতিটাকে খেয়ে ফেললো। ভেড়া অবাক হয়ে দেখলো সেই গিরগিটিটাকে।

গিরগিটিটা লম্বায় তের, চৌদ্দ ইঞ্চি হবে। দেহ আর লেজের দৈর্ঘ্য প্রায় এক। লেজটা একেবারে সরু। সামনের পায়ের একটু তলা থেকে চামড়ার ডানাটা পেছনের পায়ের আগ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। যেন ভাঁজ-করা একটা হাত পাখা। বুকের পাঁজরের মত অনেকগুলো পাঁজর রয়েছে ডানাটায়। সেগুলোর সাহায্যেই ডানাগুলো একবার খুলছে এবং বন্ধ করছে। চামড়ার ডানাগুলোতে রংয়ের ছড়াছড়ি। তার দেখাদেখি অন্য টিকটিকিরাও শূন্যে লাফিয়ে উঠে ডানা মেলে দিল। আর উড়ে উড়ে মনের আনন্দে পোকামাকড় ধরে ধরে খেতে লাগলো।

ভেড়া দেখলো সেখানে যেন রংয়ের হাট বসেছে।

পাঁচ

এত সব কাণ্ড শুনে শেয়ালপণ্ডিত ডানার জন্য জেদ ধরলো।

—না !

ডানা তার চাই-ই। তা না হলে তার চলছে না। সবার ডানা আছে তার নেই। এ কেমন কথা।

তাই সে ঠিক করলো এবার থেকে সে ধার্মিক হবে। হিংসা ত্যাগ করে ধর্মকর্মে মন দেবে। তা হলে নিশ্চয়ই তার ডানা গজাবে।

এই ভেবে সে এগিয়ে চললো গঙ্গার দিকে। গঙ্গার জলে স্নান করে গঙ্গামাটি দিয়ে তিলক কেটে সে তার সমস্ত পাপ দূর করবে। তারপর যাবে হিমালয়ে। সেখানে একাকী শান্তিতে ভগবানের নাম জপ করবে।

গঙ্গার জলে শেয়ালপণ্ডিত ডুব দিতে যাবে, এই সময় দেখলো তার একহাত দূরেই একটা নাদুসনুদুস দু'ফুট লম্বা মাছ জলের উপর ভেসে আছে। পরম নিশ্চিন্তে সেই মাছটা লেজ নাড়ছে।

লেজটা দু'ভাগে ভাগ। নিচের ভাগটাই বড়।

শেয়ালপণ্ডিতের মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে এলো মাছটাকে দেখে। ভুলে গেল ধর্মকর্মের কথা।

চুপিচুপি জলের ভিতর মুখ আগিয়ে হিংস্র দাঁত বের করে লাফিয়ে পড়লো মাছটার উপর।

মাছটা নিমেষের মধ্যে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো।

অবাক হলো শেয়ালপণ্ডিত। একি! মাছটা যে শূন্যে ডানা মেলে দিব্যি উড়ে চলেছে! ডানাগুলো কম ছোট না। প্রায় ন'দশ ইঞ্চি চওড়া হবে।

মাছটা উড়তে উড়তে প্রায় দু'শ গজ দূরে চলে গেল। তারপর জলে নামলো।

শেয়ালপণ্ডিত ওদিকে তাকিয়ে ভাবলো, ইস্ শেষে কিনা ওই মাছগুলোরও ডানা গজালো।

রাগ হলো তার ভগবানের উপর। ভগবান সবাইকে ডানা দিল, শুধু তাকেই দিল না। তার যদি আজ ডানা থাকতো, ওই মাছটা কি অমনি করে লাফিয়ে যেতে পারতো। পিছু নিয়ে ওই মাছটাকে ধরে মনের সুখে বেশ খাওয়া যেতো।

এমনি সময় তার দশ হাত দূরে মাছটা আবার ভেসে উঠলো। মাছটা শূন্যে লাফিয়ে ডানা মেলে বললো—হে বিড়াল তপস্বী, আমি ভূমধ্যসাগর থেকে আসছি। আমার নাম এক্সোসিটাস। আমার কাছে তোমার শমন আছে।

—শমন! হুঁয়া হুঁ হো হো হো বলছিস কি হে পুঁটকে মাছ।—হেসে জলের মধ্যে লুটোপুটি খেলো শেয়ালপণ্ডিত। ডানার গর্ব যে আর ধরে না! দেখিস্ তুই না আবার শমন নিয়েই আমার পেটে চলে যাস্।

—হুঁ, বললেই হলো আর কি! তবে আর আমার পূর্বপুরুষেরা অত কষ্ট করে, এই ডানাটা করে দিয়ে গেল কেন? তাদের আমল হলে না হয় এক কথা ছিল। তখন তাদের ডানা ছিল না। তাই বড় বড় হাঙ্গর, ডলফিন এদের হাত থেকে তারা রেহাই পেতো না। অনেক কষ্ট, অনেক
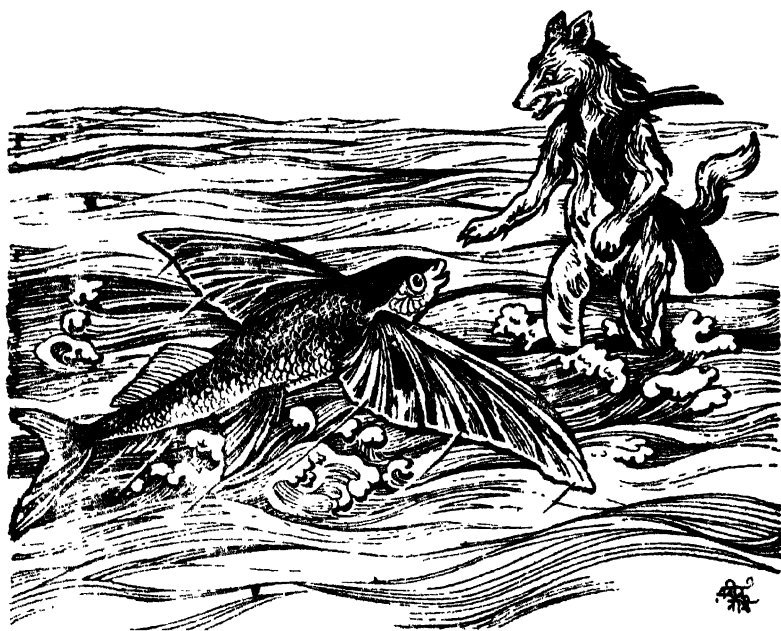
সাধ্যসাধনায় অনেক পুরুষ পর আমরা ডানা পেলাম। পেলাম ঠিক নয়, আমাদের এই কানকোর পাখনাটাকে ডানার মত বড় করে ফেললাম, এখন আর আমাদের ভয় কিসে? ওই সব দৈত্যের মত হাঙ্গররাই নাগাল পায় না। আর তুমি তো চুনোপুটি। তোমার সাধ্য আছে আমাকে ছোঁয়ার! —এই বলে উড়ন্ত মাছটা জলে নামলো।

মিনিট দুই সাঁতার কাটলো জলে। তারপর আবার শূন্যে উড়তে উড়তে বললো,—শোনো হে ভণ্ড! আমাকে ব্রিটিশ উপকূলের এক্সোসিটাস ভায়েরা এসে খবর দিয়ে গেছে তোমাকে জানাতে যে তোমার আয়ু আর বেশী দিন নেই। খুব শীগ্‌গিরই তোমার পাপের জন্য তোমাকে হত্যা করা হবে। যদি তুমি ধার্মিক হয়ে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত না কর, তবে এর কোন হেরফের হবে না।

—আক্কা হুঁয়া হুঁয়া হুঁ—ডাক দিয়ে শেয়ালপণ্ডিত হো হো করে হেসে বললো,—হত্যাটা করবে কে, তুই?

খুব যে হাসছো হে পণ্ডিত। তবে শোনো সব বলি। বৃটিশ উপকূলে এসে আটলান্টিক মহাসাগরের ছোট ছোট এক্সোসিটাস ভায়েরা এই খবর দিয়ে গেছে। আর বলে গেছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকেই তোমার মৃত্যুদণ্ড নিয়ে আসবে এক ধর্ম-জল্লাদ। —এই বলে সেই উড়ন্ত মাছটা একটু জলে নেমে আবার পাড়ি দিল শূন্যে।

জল থেকে ঠিক দু-তিন ফুট উঁচুতে থেকে উড়তে উড়তে ভাঁটার দিকে গা ভাসালো উড়ন্ত মাছটা। নিমেষেই হারিয়ে গেল শেয়ালপণ্ডিতের দৃষ্টি থেকে।

শেয়ালপণ্ডিত সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললো,—দূর,

যতসব আজগুবি। তারপর সে গঙ্গা জলে ডুব দিয়ে পারে উঠলো। গঙ্গার মাটি দিয়ে তিলক কেটে হিমালয়ের দিকে হাঁটতে লাগলো।

শেয়ালপণ্ডিত হরির নাম জপ করতে করতে পথ চলছিল, আর ধেই ধেই করে নাচছিল। পথের আশে পাশে জীবজন্তুরা দেখে কেউ মুচকি হাসলো, কেউ ফোড়ন কাটলো, কেউ পিছু নিল। এমনি করে যেতে যেতে দুপুর হয়ে এলো। তার শরীরও ক্লান্ত হলো। তাই সামনে একটা বড় গাছের ছায়ায় একটু জিরোতে বসলো।

ছয়

জিরোতে গিয়ে মনের মধ্যে নানান কথার ভিড় জমে গেল।

ছোট বড় নানান ছবির দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল মনে। তার সঙ্গে আবার মাঝে মাঝে ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নও ঝিলিক দিয়ে চললো বার কয়েক। চোখের পাতা দুটো স্বপ্নভরা আমেজে বুজে এলো।

তন্দ্রা নামলো চোখে।

এমনি সময় ধুপ করে একটা আওয়াজ হতেই চোখের পাতা গেল খুলে। শব্দের পেছনে দৃষ্টি ছুটলো। একটা ছোট্ট ব্যাঙের উপর দৃষ্টি গিয়ে থামলো।

তন্দ্রা গেল ছুটে।

ব্যাঙটাকে দেখে অবাক হয়ে গেল শেয়ালপণ্ডিত। ছোট্ট একটা ব্যাঙ সামনের ঝোপে ডালে ডালে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

ব্যাপারটা বড় মজাদার মনে হলো।

ব্যাঙ থাকে মাটিতে। সে যে আবার গাছে ওঠে, শূন্যে উড়তে পারে, এ খবরটাতো জানা ছিল না। তাই সে সামনের দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে বেশ মনোযোগ দিয়েই দেখতে লাগলো ব্যাঙটাকে।

ব্যাঙটা শূন্যে ভাসছে। এদিক ওদিক ঘুরছে, কিন্তু মজার কথা ব্যাঙটার কোন ডানা নেই। সামনের আর পেছনের

পা'য়ের আঙুলগুলোর ফাঁকে ফাঁকে চামড়ার পর্দা ছড়িয়ে আছে। পায়ের পাতাগুলোকে এক একটা ছোট ছোট হাত-পাখা বলে মনে হচ্ছে।

এমন সময় ব্যাঙটার পেছনের একটা ঝোপে খসখস শব্দ হলো।

সেদিকে তাকাতেই শিয়াল শিউরে উঠলো, একটা সরু সবুজ সাপ লিকলিকে জিভ বের করে এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছে এই ব্যাঙটার দিকে। ব্যাঙটা একটুও টের পায় নি।

এমন সময় ধুপ করে কোথাও একটা বুঝি ফল পড়ার শব্দ হলো। সে শব্দে ব্যাঙটা আবার শূন্যে ভেসে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো।

পিছন ফিরতেই সাপটা চোখে পড়লো। আর অমনি উল্টো দিকের একটা ডালে নেমে সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে শূন্যে পাড়ি দিল।

সাপটাও তার পিছু নিল।

কিন্তু ওকি!

শেয়ালপণ্ডিত তড়াক করে চার পায়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। এ সাপটাও যে শূন্যে ভাসছে!

সরু সাপটা তার দেহকে ফুলিয়ে বাঁকিয়ে মোটা পাইপের মত করে তুলেছে। দিব্যি উঠানামা করে উড়ন্ত সেই ব্যাঙটার পিছন পিছন ধাওয়া করছে।

কৌতূহল চাপতে না পেরে শেয়ালপণ্ডিতও ওদের পিছু নিল।

ব্যাঙ ও সাপ দু'ই উড়ছে।

অথচ এদের কারুরই ডানা নেই।

ওড়ার ঢংও পাখীর মত নয়, খানিক শূন্যে ভেসে থাকে। তারপর সামনের বা পাশের ডালে লাফিয়ে বসে, পলক পড়তে না পড়তে সেখান থেকে আবার শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুজনেই এভাবে সমানে উড়ছে। আর তাদের পিছু পিছু ছুটে চলছে শেয়ালপণ্ডিত।

উড়তে উড়তে হঠাৎ উড়ন্ত ব্যাঙটা একটা ঝোপের ভিতর কখন হারিয়ে গেল, তা না সাপ না শেয়াল কেউই টের পেল না, সাপটা ঝোপের চারপাশে কিছুক্ষণ উড়ে একটা ডালে চুপটি করে বসে রইলো। শেয়ালপণ্ডিত সেই ঝোপ থেকে একটু-খানি দূরে মাটিতে বসে তাকিয়ে রইলো সাপটার দিকে।

দূরে কোথায় যেন কয়েকটা শেয়াল ডেকে উঠলো।

শেয়ালপণ্ডিত অনেক কষ্টে নিজের মনটাকে চেপে রাখলো। কি জানি শব্দ করলে যদি সাপটা পালিয়ে যায়।

চুপ করে রইলো ওদিকে তাকিয়ে। আবার অনেকগুলো শেয়ালের ডাক ভেসে এলো।

এবার আর থাকতে পারলো না শেয়ালপণ্ডিত

—হুঁয়া হুঁ আক্কা হুয়া—ডাক দিয়ে উঠলো।

বিকট শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাকালো সাপটা, বিরক্তিতে নড়ে উঠলো। তারপরেই দেহ ঘুরিয়ে দিল ঝাঁপ শেয়ালের দিকে।

শেয়াল পড়ি কি মরি করে ছুটতে লাগলো।

পিছনে তাকাবার অবসরও পেলো না।

সাপটা ঘাড়ের কাছে এসে পড়লো বলে।

ফাঁকা জায়গা ছেড়ে শেয়াল ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগলো।

সাপটা পিছু ছাড়লো না।

সিঁ সিঁ আওয়াজ করতে করতে শেয়ালকে ধাওয়া করলো।

শিয়াল প্রমাদ গুনলো।

প্রাণপণে ছুটতে লাগলো চড়াই-উৎরাই ঝোপ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একটা জীর্ণ গাছের গুঁড়িতে পা পড়তেই পিছলে পড়ে গেল শেয়ালপণ্ডিত। জায়গাটা বড় ঢালু ছিল। পিছনে পড়তেই গড়াতে গড়াতে একটা ঝোপের ভিতর হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

সাপটা বোধ হয় দিক ভুল করলো। সে সেই ঝোপটাকে বাঁয়ে ফেলে উড়ে চলে গেল।

শেয়াল হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

ধুঁকতে লাগলো।

গা বেয়ে রক্ত ঝরছে। হাড়গোড় কোথাও বোধ হয় ভেঙ্গেছে।

টনটন করছে ব্যাথায়। ক্লান্তিতে দেহ মন শিথিল হয়ে গেছে।

বুক জ্বালা করছে।

মনে মনে উড়ন্ত সাপটার শাপশাপান্ত করলো অনেকবার।

ইস্ তার যদি ডানা থাকতো, এই সাপটাকে আজ দেখিয়ে দিত। দূর পাল্লায় পাড়ি দিয়ে হিম্মত যাচাই করতে পারতো। সাপটাকে নাকানি চোবানি খাইয়ে তবে ছাড়তো।

সে বেশ মজার হোতো।

সাত

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল ক্লান্ত শেয়াল।

ঘুমটা গাঢ় হতেই শেয়ালের সামনের পা দুটো জড় হয়ে নড়াচড়া করতে লাগলো।

যেন খোল করতাল বাজাচ্ছে।

পিছনের পা দু'টো তালে তালে নড়তে লাগলো নাচের ভঙ্গিতে।

শেয়ালপণ্ডিত খোল করতাল বাজিয়ে এগিয়ে চললো হিমালয়ের দিকে।

ডানা তাব চাই-ই।

হিমালয়ের চূড়ায় সে ধ্যান করতে বসবে ডানার জন্য। ডানা নিয়ে তবে সে আবার ফিরে আসবে তার বাসভূমিতে।

করতাল বাজিয়ে নাম কীর্তন করতে করতে পথ চলতে লাগলো শেয়ালপণ্ডিত। তার নাচ দেখার জন্য পথের দুধারে ছোট ছোট জীবজন্তুদের ছোটোখাটো ভিড় জমে গেল।

শেয়ালের ধেই ধেই নাচ দেখে ছোট ছোট জন্তুরা নানা রকম কথা বলতে লাগলো।

কেউ বললো—নিশ্চয় শেয়াল শিকারের খোঁজ পেয়েছে।

—খোঁজ নয় খাঁজ নয় ভূরি ভোজ সেরেই ফিরছে, তাই এত ফূর্তি।

হঠাৎ ওদের কথাও বন্ধ হয়ে গেল।

একটা ছায়া শেয়ালের পিছন পিছন ছুটতে দেখলো।

সবাই একসঙ্গে আকাশের দিকে তাকালো।

মস্ত একটা পাখীর মত কি একটা যেন ছুটে আসছে প্রচণ্ড গতিতে।

ওরা সব ভয় পেয়ে গেল।

খরগোসের দল থেকে কে যেন শেয়ালকে ডেকে বললো,—ও পণ্ডিত মশায়,. পণ্ডিত মশায়, আপনার পিছু পিছু যে একটা ছায়াও ছুটে আসছে।

শেয়াল চোখ খুলে তাকালো।

নিজের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার।

দেখলো সত্যি তাই। একটা বড় ছায়া যেন তার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলেছে।

উপরে তাকালো।

ও বাবা, তাইতো!

কি একটা যেন উড়ে আসছে তারই দিকে। চোখ নামিয়ে পথের দু'পাশে তাকালো।

ছোট ছোট খরগোস কাঠবিড়ালী হরিণ ময়ূর আরো কত সব জন্তুরা এসে ভিড় করছে। সবার চোখেই দুষ্টুমি-ভরা কৌতূহল।

এদের নাদুসনুদুস চেহারাগুলো নজরে পড়তেই জিভ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো শেয়ালপণ্ডিতের।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ধার্মিক হবার কথাটা মনে পড়লো।

তাই আবার করতাল বাজিয়ে নাচতে নাচতে নামকীর্তন করে ভুলে থাকতে চাইলো সব।

কিন্তু সব তালগোল পাকিয়ে দিল ওই ছায়াটা।

শেয়াল যত এগুচ্ছে ছায়াটাও তত বাড়ছে। সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেল শেয়ালটা।

মনে পড়ে গেল উড়ন্ত মাছের শমনের কথা।

নদীর জলে উড়ন্ত মাছটার নাদুসনুদুস চেহারা দেখে লোভ সামলাতে না পেরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মাছটার উপর। কিন্তু মাছটা পালিয়ে গিয়েছিল উড়ে।

আর যাবার সময় শমনটা শুনিয়ে গিয়েছিল: দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এক ধর্মজল্লাদ নাকি তার মৃত্যুদণ্ড নিয়ে

আসবে। তার অধর্মের জন্যে ভগবান নাকি তার শাস্তি মৃত্যু বলে ঘোষণা করেছেন।

তখন বিশ্বাস হয় নি, কিন্তু ছায়াটা তাকে যেভাবে অনুসরণ করছে তা দেখে মনে হচ্ছে এই সেই ধর্মজল্লাদ।

শেয়ালপণ্ডিত লেজগুটিয়ে ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে পালাতে লাগলো।

ছায়াটাও চললো তার পিছু পিছু।

দেখতে দেখতে ছায়াটাও মস্ত বড় হয়ে গেল।

এ ছায়াটাকে দেখে বনের পশুরা ভিরমি খেয়ে গেল।

'ত্রাহি' ডাক ছুটলো তাদের মুখে।

পালাতে লাগলো সব বন ছেড়ে।

নিমেষের মধ্যে যেন একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেল বনে।

ছায়াটা মস্ত বড় এক অদ্ভুত জীবের, না পাখী না গিরগিটির মত চেহারা।

বিশাল তার আয়তন, প্রচণ্ড তার গতিবেগ।

পাখীটার ডানার ঝাপটা বনের মধ্যে যেন তুমুল ঝড় তুলে দিল।

পড়ি কি মরি করে বনের পশুরা যে যেদিকে পারলো ছুটতে লাগলো। এমন কি ছোট ছোট পিঁপড়েরা পর্যন্ত প্রমাদ গুনলো, তারা কোথায় লুকোবে, ভেবে কূল কিনারা পেলো না।

অদ্ভুত পাখীটার কিন্তু লক্ষ্য ছিল শুধু শেয়ালের ওপর।

অনেক উঁচু থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে ঝড়ের মত ছুটে আসছিল হাতীর মত বিরাট পাখীটা।

এর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রাণপণে ছুটে চলেছে শেয়াল।

ছুটতে ছুটতে হাত পা অবশ হয়ে এলো যেন। চোখ দুটো ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরছে কাঁটা ঝোপের আঁচড়ে আর আছাড়ে। জিভ বেরিয়ে আসছে অসহ্য যন্ত্রণায়। চলার আর শক্তি নেই। দৃষ্টি আবছা হয়ে এসেছে। তার মধ্যেই চোখে পড়লো ছোট্ট একটা গুহা।

সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের দেহটাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইলো ওই গুহায়।

কিন্তু তার আগেই পাখীটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো শেয়ালের উপর।

শেয়াল সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করতে চাইলো।

কিন্তু গলার স্বর বেরুলো না একটুও।

শুধু গোঁঙানি বেরুলো মুখ দিয়ে।

আট

শেয়াল যেখানে শুয়েছিল তার পাশ দিয়ে ভেড়া বাড়ীর পথের খোঁজে এগিয়ে যাচ্ছিলো, হঠাৎ গোঁঙানির শব্দ কানে আসাতে শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

কাছে গিয়েই সে অবাক হয়ে গেল। দেখলো শেয়ালপণ্ডিত একটা গাছের তলায় ছটফট করছে, মনে হলো যেন কোন স্বপ্ন দেখে খুব ভয় পেয়েছে শেয়ালপণ্ডিত।

ভেড়া আরো কাছে এগিয়ে গেল, একবার ভাবলো জাগিয়ে দিই শেয়ালপণ্ডিতকে। আবার ভয়ও হতে লাগলো যদি জেগেই আবার তাকে ঝাপটে ধরে।

শেয়ালপণ্ডিতের সারা দেহটা আর একবার তাকিয়ে দেখলো ভেড়া, রক্তের দাগ রয়েছে সারা দেহে।

দেহটা বড় ক্লান্ত। করুণা হলো দেখে।

শেয়ালের পিঠ ধরে ঝাকুনি দিল ভেড়া— ও পণ্ডিতমশাই, পণ্ডিতমশাই—উঠুন।

ঝাকুনি খেয়ে লাফিয়ে উঠলো শেয়ালপণ্ডিত।

উঠেই 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার করে পালাতে চাইলো।

কিন্তু পালাতে পারলো না। পিছনের পা'টা বোধ হয় ভেঙেই গেছে। দাঁড়াতে গিয়ে পিছন দিকে উল্টে পড়ে গেল। কনকন করে উঠলো ব্যথায়।

আস্তে আস্তে দেহটাকে সামলে গুটিয়ে বসলো শেয়াল-পণ্ডিত।

চারদিকে তাকাতে লাগলো সে। তার পাশে ভেড়াকে দেখে অবাক হয়ে গেল। আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলো, —আমি কোথায় ?

—কেন গো পণ্ডিতমশাই, এই তো আপনি হিমালয়ের পাদদেশে।

—হিমালয়ের পাদদেশে ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

—হাতীর মত পাখীটা গেল কোথায় ?

—হাতীর মত পাখী, সে আবার কি ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, হাতীর মত মস্ত পাখী, বড় অদ্ভুত পাখী, মুখটা মোটেই পাখীর মত নয়। অনেকটা বড় জাতের গিরগিটিদের মত। ডানাটা বিরাট, প্রায় কুড়ি পাঁচিশ ফুট হবে। ডানায় কেন, সারা দেহের কোথাও পালক নেই।

—ও বাবা সে আবার কি ? পালক নেই তবে পাখী হতে যাবে কেন ?

—তাই তো ভাবছি ! কিন্তু উড়তে পারে যে ভীষণ।

—হুতোম থুম—ওহে শেয়ালপণ্ডিত, তাকে কোথায় দেখেছো ?—গাছের ডাল থেকে যেন কে বলে উঠলো।

ভেড়া ও শেয়াল উভয়েই তাকালো উপরে। একটা বৃদ্ধা পেঁচা তাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

—স্বপ্ন দেখছিলে বুঝি ! তাইতো ভাবছিলাম। তুমি ঘুমের ঘোরে অত ছটফট করছো কেন !—তারপর মাথা নেড়ে পেঁচা বললো—তা হাতীর মত পাখীর কথা বলছিলে, সে কেমন দেখতে ?

—ও বাবা, ও বড় বিশ্রী দেখতে, অদ্ভুত তার চেহারা। ও চেহারার কথা শুনলেই আঁৎকে উঠবে।

—আহা বলুন না শুনি। ভেড়া বললো। একটু হাঁফিয়ে নিয়ে শেয়ালপণ্ডিত বললো,—ওর দেহটা খুব একটা বড় নয়। তার তুলনায় ডানা দু'টো মস্ত বড়। মুখ মাথা গলা গিরগিটিদের মত। দেহে একটাও পালক নেই। অথচ ডানা আছে, দিব্যি উড়তে পারে।

—ডানাটা কি চামড়ার ? পেঁচা জিজ্ঞেস করলো।

—ঠিক বলেছো তো তুমি, চামড়ারই ডানা পায়ের গোড়ালি থেকে হাতের পাতা পর্যন্ত এ ডানা জুড়ে আছে। আরো অদ্ভুত কি জানো, এদের একটা সরু লেজ আছে, আবার লেজের শেষটা রম্বসের মত দেখতে।

—ও আচ্ছা বুঝেছি, বুঝেছি। হুতুম থুম হুতুম—ডাক দিয়ে পেঁচাটা একবার ডানা ঝাপটে নড়ে বসলো, বললো,— তুমি যাকে স্বপ্নে দেখেছো সে অনেক পুরনো কালের প্রাণী হে। আদ্দিকালের বদ্দি প্রাণী, এ প্রায় একশ কোটি বৎসর আগের জীব।

—ও বাবা এরকম প্রাণীও ছিল নাকি তখন ! এ শুনে তো মনে হচ্ছে কোন এক রূপকথার আজব ডানাওয়ালা ড্রাগন !

—ঠিকই বলেছো,—পেঁচা বিজ্ঞের হাসি হেসে বললো,— পুরনো দিনের সব কথাই তো রূপকথা, এ সে রূপকথার উড়ন্ত ড্রাগন। তখনকার জীবজন্তুদের কথা শুনলে বিশ্বাসই হবে না, কি বিশাল এক একটার আয়তন ! তিরিশ চল্লিশ ফুট দেহ নিয়ে কি দৌরাত্ম্যটাই না করতো তারা। সবই গিরগিটিদের বংশধর ছিল।

—গিরগিটিদের বংশধর !—ভেড়া শুনে অবাক হলো,—গিরগিটিরা তো খুব বড় হয় না।

—সে জন্যেই তো বলছি—পেঁচা বললো, ওদের কথা বললে বিশ্বাসই হবে না। আজকের দিনের অতি বড় গিরগিটি বা অতি বড় জীবও ওদের কাছে চুনোপুটি। যখনকার কথা বলছি তখন পৃথিবীতে এই গিরিগিটিদের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ছিল। কি জলে কি ডাঙায় মারামারি খুনোখুনি করে এক বীভৎসতায় দিন যাপন করতো। আকাশও শূন্য ছিল না। এদেরই এক ভাই আকাশের নবাব হয়ে বসলো। শেয়াল যাকে স্বপ্নে দেখেছো বলছো এ সেই কালের গতিতে হারিয়ে যাওয়া নবাব, উড়ন্ত ড্রাগন।

'হারিয়ে যাওয়া' কেন, এরা কি এখন নেই ? শেয়াল ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলো।

—না হে না, কি যে বল তার ঠিক নেই। বলছি-না এরা একশ' কোটি বৎসর আগেকার প্রাণী, এখন এদের পাচ্ছো কোথায় ?

শেয়াল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

একটু নড়েচড়ে বসলো।

পেঁচা আবার বললো,—এই উড়ন্ত ড্রাগন পৃথিবীর সব জায়গাতেই ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। আর ঘুরবে নাই বা কেন, এরা খুব উড়তে পারতো। ডানার তুলনায় দেহটাতো ছোট ছিলই, তা ছাড়া ওজনেও খুব হাল্কা ছিল, তাই আকাশে পাড়ি দিতে এদের খুব অসুবিধা হতো না তবে অত বড় ডানা নিয়ে জঙ্গলে চলাফেরা করতে পারতো না। গাছের ওপরে বা পাহাড়-পর্বতে থাকতো।

—আচ্ছা ওরা খেতো কি ? শেয়াল জিজ্ঞেস করলো।

—খাওয়া দাওয়াগুলো তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য না। এই উড়ন্ত ড্রাগনরা তো দু'রকমের ছিল। একদলের চেহারা ওই হাতীর মত মস্ত বড়। আবার আর একদলের চেহারা ছিল খুব ছোট, ডানাসমেত পাঁচ ছ' মিটার লম্বা হবে। কেবল এদেরই দাঁত আছে, তাই এরা ছোট ছোট পোকামাকড় ইত্যাদি খেতো। বড়দের দাঁত ছিল না। তবে চোয়ালের মাড়িগুলো বেশ ধারালো ছিল। ওরা জলে ডুব দিয়ে মাছ ধরে খেতো।

—তুমি বলছো এরা বহু বৎসর পূর্বের প্রাণী, কিন্তু এদের সম্বন্ধে এতো জানলে কি করে ? শেয়াল ভ্রূ কঁচকে প্রশ্ন করলো।

—আমি এতসব শুনেছি আমার ঠাকুরদার কাছে, ছোট-বেলায় যখন তাঁকে খুব জ্বালাতন করতাম তখন তিনি ভয় দেখিয়ে বলতেন,—ওই ঢ্যাখ্, উড়ন্ত ড্রাগন আসছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে।

—দক্ষিণ আমেরিকা থেকে! আঁৎকে উঠলো শেয়াল-পণ্ডিত।—উড়ন্ত মাছটাও তো আমাকে শাসিয়ে গেছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কে যেন আমার মৃত্যুদণ্ড নিয়ে আসছে।

—আরে ভয় পেয়ো না পণ্ডিত। সান্ত্বনা দিয়ে পেঁচা বললো, এদের আসার কোন সম্ভাবনাই নেই। এরা যে শুধু দক্ষিণ আমেরিকায় থাকতো তা নয়। ব্রাজিল, ইউরোপ প্রভৃতি জায়গাতেও এদের রাজত্ব ছিল।

—এরা যে আদৌ পৃথিবীর প্রাণী তারই বা প্রমাণ কি ? এদের তো আর কেউ দেখেই নি।—ভেড়া বললো।

—হুঁ হুঁ ওকথা বলো না। পেঁচা খুব জোরে মাথা নেড়ে

বললো,—ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এদের অনেক জীবাশ্ম পাওয়া গেছে নানা জায়গায়। তবে প্রথম পাওয়া গিয়েছিল জার্মানীর ব্যাভারিয়া শহরে। এই জীবাশ্ম দেখেই ওদের নানা পরিবারের কথাও জানা গেছে, নাম দেওয়া হয়েছে ওদের যেমন রামফরহিন্‌কাস ফাইলুসাস্‌, টেরোডাকটিলাস্‌ ইত্যাদি।

—বাঃ এতো বেশ অবাক করা কথা শুনালে হে, কিন্তু ভাই একালেও তো উড়ন্ত জীবজন্তুর অভাব নেই। এই একটু আগে একটা সাপ আমাকে তাড়া করছিলো। শুনলে অবাক হবে ভাই, এও দেখি আমাকে উড়ে তাড়া করছিলো, শুধু আমাকে নয় আমার আগে একটা ব্যাঙকে তাড়া করছিল। মজার কথা কি জানো, সেই ব্যাঙটাও দেখলাম উড়তে পারে।

শেয়াল বাঁ পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

পেঁচা হাসতে হাসতে বললো,—ওহো তুমি উড়ন্ত সাপের কথা বলছো! আরে ওরাও তো গিরগিটিদেরই জাতভাই। আর ওরা তো সত্যিকারের উড়তে পারে না, শূন্যে ভাসতে পারে মাত্র। উঁচু জায়গা থেকে ঝাঁপ না দিলে তো ভাসতেও পারে না। আর তাছাড়া ওদের তো ডানাও নেই।

—ডানা নেই! ভেড়া অবাক হয়ে বললো, তবে ওড়ে কি করে?

—ওড়ে ওদের দেহের চামড়া দিয়ে। দেহের চামড়ার আবরণটা একটু ঝুলানো। যখন শূন্যে ভাসার প্রয়োজন হয় চামড়াটা ফুলিয়ে চ্যাপটা নলের মত করে নেয়, তাতেই শূন্যে ভেসে থাকতে পারে।

—কিন্তু ব্যাঙের দেহে তো সেরকম চামড়া নেই। তবে সে ওড়ে কি ভাবে? শেয়াল প্রশ্ন করলো।

—ব্যাঙেরও ওই একই ব্যাপার। সেও ঠিক উড়ে না, শূন্যে ভাসে। তার ডানা না থাকলে কি হবে, হাত এবং পায়ের আঙুলগুলো একটা আর একটার সাথে বেশ বড় চামড়া দিয়ে আঁটা। যখন সে ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায় তখন এই হাত পায়ের চামড়াগুলোকে খুলে দেয়। দেখে মনে হয় যেন এক একটা তিন-চার বর্গ ইঞ্চির ছোট ছোট প্যারাসুট, দেহটাও তো খুব বড় নয়, মাত্র তিন চার ইঞ্চি। কাজেই ওই চারটা প্যারাসুটের সাহায্যে শূন্যে ভাসতে মোটেই অসুবিধা হয় না। তবে ওরা এখানে এলো কি করে সেটাই ভাবছি ওরা তো থাকে সেই বোর্ণিওতে।

অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ রইলো।

বোধহয় উড়ন্ত জীবজন্তুদের ছবিগুলোই ওদের মনের পর্দায় ভেসে বেড়াচ্ছিলো।

ভেড়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললো,—পণ্ডিতমশাই, আপনি তিলক কেটে এই পথে কোথায় যাচ্ছিলেন?

শেয়াল অনেকক্ষণ উদাসভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো—যাচ্ছি হিমালয়ে।

—হিমালয়ে! পেঁচা বললো, সেখানে কি করবে?

—সেখানে ধ্যান করবো, যদ্দিন না ভগবান আমায় ডানা দিচ্ছেন আর হিমালয় থেকে ফিরবো না।

পেঁচা হেসে উঠলো হো হো করে। ভেড়ার দিকে ঘুরে তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমিও ভাই হিমালয়ে যাবে নাকি?

—না না আমি বাড়ী যাবো, কিন্তু—

—হ্যাঁ হ্যাঁ তুই বাড়ী যা। এবার থেকে আমার টোলটা তুই-ই চালাস আর সবাইকে আমার খবরটা দিস! আমি চললাম।

বলতে বলতে শেয়ালপণ্ডিত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগলো, যেতে যেতে বললো,—দেখিস আমি ডানা নিয়েই ফিরবো।

ভেড়া এবং পেঁচা শেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ঝোপঝাড়ের ভিতর শেয়াল হারিয়ে গেল।

ভেড়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পেঁচাকে বললো,—আচ্ছা ভাই পেঁচা, আমাকে একটু বাড়ী পৌঁছে দিতে পারো। অনেকদিন ধরে বন থেকে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু বাড়ীর পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

—ওমা এ আর তেমন কাজ কি ! চল তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি। হুতুম থুম, হুতুম থুম।

পেঁচা ডালে ডালে আর ভেড়া মাটিতে হেঁটে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো।

ভেড়া যেতে যেতে ভাবছে এবারে তাকে তাহলে পণ্ডিতি করতে হবে শেয়ালপণ্ডিতের টোলে। গুরুর আদেশ তো আর ফেলনা নয়।

ওদিকে শেয়াল ভাবছে যোগ্য শিষ্য রেখে গেলাম, আমার দায়িত্ব শেষ, এবারে আমার সামনে কঠিন পথ।

কঠিন সাধনা।

পাখা আমাকে পেতেই হবে।

স্বপ্ন দেখে শেয়ালপণ্ডিত, পাখায় ভর দিয়ে সে উড়ে চলেছে নীল আকাশে।

মাটি তো তার পর হয়ে যায়নি।

ইচ্ছে করলেই সে মাটিতে নেমে আসতে পারবে, তার এতদিনের চেনাশোনা জগৎটাকে ছুঁয়ে আসতে পারবে।

স্বপ্ন দেখে শেয়ালপণ্ডিত।

আকাশের স্বপ্ন !